ছেলেধরা

এক ধরনের মানুষ আছে যাদের পদ্মপাতার সঙ্গে তুলনা করা যায়। সংসারের নানাবিধ ঝড়-ঝাপটা এদের উপর দিয়ে বয়ে গেলেও এদের স্পর্শ করে না। এরা নমস্য, মহাপুরুষ। আমার মা পুরোপুরি তাদের দলভুক্ত না হলেও একদিক থেকে কিন্তু পদ্মপাতার সঙ্গে আশ্চর্য মিল আছে মা'র। জ্ঞান হয়ে অবধি সংসারের সর্বঘাটে ক্রমাগত ঠকেই আসতে দেখেছি মাকে এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিখে শিখে চোখ খুলে গেছে আমাদের তিন ভাইবোনের। কিন্তু মায়ের চোখ ফোটার কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায়নি কোনদিন।

জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলো আঁচড়ও কাটতে পারেনি মাকে। এখনও সকালে সবজির দোকানে যাবার মুখে চোখে গগল্‌স্, গলায় চেক চেক রুমাল বাঁধা, দাড়ি-গোঁফওলা কোনও ছোকরা মার সামনে ব্লাইণ্ড রিলিফের ছাপানো কার্ড এগিয়ে দিলে মা বাজার খরচের জন্যে সামান্য যৎকিঞ্চিত রেখে নির্বিবাদে বটুয়া উজাড় করে দেবেন তাকে। এবং ছেলেটি যদি মার দেওয়া দশ পয়সা, পঁচিশ পয়সার ভিড় থেকে খুঁজে পেতে অচল একটি মুদ্রা ফেরত দেয় মা লজ্জায় জিভ কেটে বলবেন, "ছি ছি আমার ভিমরতি ধরেছে। ইস্ কি মহাপাপ করেছিলুম অন্ধ মানুষকে অচল চোয়ানি চালিয়ে!" খুঁতো পয়সাটাকে পালটে দেবেন অচিরাৎ। খানিক পরে বাজার-ফেরত মোড়ের চায়ের দোকানে দাড়ি-গোঁফওলা, গলায় চেক চেক রুমাল বাঁধা ছোকরাটিকে এক প্লেট পাকোড়া সাঁটাতে সাঁটাতে পথচারিণীদের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে মোটেই চমকে বা রেগে যাবেন না আমার মা। বরং নিজের মনে মন্তব্য করবেন, "চেককাটা রুমাল আর দাড়ি-গোঁফে ছেয়ে গেল দেশটা। যখন যা হুজুগ উঠবে সক্কলের তাই করা চাই।" এবং ওঁর একমাত্র পুত্র শ্রীমান বাচ্চুর যে এ সমস্ত উপসর্গ গজায়নি সে কথা ভেবে ভারি স্বস্তি অনুভব করবেন মনে মনে।

এহেন মাকে নিয়ে আমাদের ভাইবোনেদের যে রীতিমত দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে সারাজীবন একথা বলাই বাহুল্য। আমরা যতই ওঁকে চোখে চোখে রাখি না কেন, তারই ফাঁকে ফোকরে ঠিকই ঠকে আসেন মা। বিশ্বের যত ঠগ জোচ্চোররাই যে শুধু মাকে ঠকানোর জন্যে হন্যে হয়ে আছে তাই নয়, মাও যেন ঠকার জন্যে উন্মুখ। কিন্তু তাই বলে জীবনভোর তো আর আমরা ওঁকে আগলে বসে থাকতে পারি না। দিদি ডাক্তারী পাশ করে আমেরিকা চলে গেল। ছোট ভাই বাচ্চু দিল্লীর আই.আই.টি.তে ভর্তি হল। আর আমি পর পর তিনবার পরীক্ষা দিয়েও যখন হাইয়ার সেকেণ্ডারী পাশ করতে পারলাম না, মা তাঁর দাদাদের পরামর্শমত ঝপ্ করে আমার বিয়ে দিয়ে দিলেন, তাঁদেরই জোগাড় করে দেওয়া পাত্রের সঙ্গে। আমাদের পুরোনো বাড়িটাতে বলতে গেলে রইলেন শুধু মা। কারণ বাবার থাকা না থাকা সমান। ধর্তব্যের মধ্যেই নয় সেটা।

সেবার পুজোর পর স্বামী রমেনকে নিয়ে মার কাছে যাচ্ছি। দ্বিরাগমনের পর এই প্রথম বাপের বাড়ি যাওয়া। মাকে ইচ্ছে করেই খবর দিইনি। খবর পেলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবে, নানারকম তোড়জোড় করবে আমাদের জন্যে। তার থেকে আমরা গিয়ে একেবারে অবাক করে দেবো মাকে। ট্রেন সকালে পৌঁছনোর কথা। চার ঘণ্টা লেট হয়ে শেষ অবধি পৌঁছতে দুপুর হয়ে গেল। রিক্সা থেকে নেমে দেখি বাড়িতে বেশ সোরগোল পড়ে গেছে। বারান্দায় সরু করে ভাঁজ করা শতরঞ্চি বেছানো। একপাশে কলাপাতা আর মাটির ভাঁড় জড়ো করা রয়েছে। আমাদের সাড়া পেয়ে মা রান্নাঘর থেকে খুন্তি হাতে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। রমেন প্রণাম করতে ওর মাথায় খুন্তি ঠেকিয়ে আমায় বাঁ হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আদর করতে গিয়ে একটা পোড়া গন্ধ পেয়ে ছুটলেন অন্দর পানে। আমরাও মার পিছন পিছন ভিতরে ঢুকলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, "ব্যাপার কি? কিছু যেন হচ্ছে বাড়িতে?"

মা বাঁধাকপির ধরে আসা তরকারীটায় সজোরে খুন্তি চালিয়ে বললেন, "সাধ।"

রমেন উদ্ভাসিত চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে উঠলো, "উনি টের পেলেন কি করে? লিখেছিলে নাকি?"

ধমক দিয়ে বললাম, "বুদ্ধুরাম, আমার সাধ নয়, অন্য কারও।"

কিন্তু তাই বা হয় কি করে? অবাক হয়ে ভাবছি আর এদিক ওদিক চেয়ে দেখছি। রান্নাঘরের পাশের ছোট ঘর থেকে খস্‌খস্‌ শাড়ির আওয়াজ পেয়ে উঁকি দিয়ে দেখি আমাদের পুরোনো গয়লানি শনিচরি জবুথবু হয়ে বসে আছে। আমায় দেখে মাথায় ঘোমটা টেনে মাথা নীচু করলো।

ভারি অবাক হলাম। শনিচরি এখানে কি করছে? সারাজীবন ওকে খালি মাথায় পথে ঘাটে ঘুরতে দেখেছি। রোজ হট্‌হট্‌ করে গোরু-মোষ নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় গ্রাহকের সামনে নিজে হাতে দুধ দুইয়ে যেতো সকাল-সন্ধ্যে দুবেলা। আজ তার হঠাৎ এমন কলাবউ সাজার হেতুটা কি? মা কড়াই নামিয়ে ভাতের ডেকচি বসালেন। ঘি-ভাতের জন্যে ঘিয়ে তেজপাতা গরমমশলা ছাড়লেন। আর বাসমতী চাল। সারা বাড়ি ভরে সুগন্ধ। খানিক ভাজাভাজি করে ভাতে জল ঢেলে রান্নাঘরের বাইরে এলেন।

বললেন, "তোরা দুটিতে দাঁড়িয়ে কেন? হাতমুখ ধুয়ে নে। রান্না নামতে আর দেরী নেই, একেবারে খেয়ে নেগে যা। বেলা হয়ে গেছে।"

বাধা দিয়ে বললাম, "সে না হয় হবে। কিন্তু আজকে আমাদের বাড়িতে কিসের সমারোহ সেটা বলবে তো?"

মা সলজ্জ কণ্ঠে বললেন, "তোরা আবার ঠাট্টা করবি। ঠাকুর দেবতা কোন কিছুই তো মানিস নে। শনিচরির কথা মনে আছে? ওইতো ওঘরে বসে রয়েছে। ওরই সাধ দিচ্ছি আজকে।"

আমি শুনে হাঁ।

রমেন বললো, "কি ব্যাপার?"

আমি ওর হাত ধরে অন্য ঘরে নিয়ে এলাম। একটা চৌকির উপর ধপ করে বসে পড়লাম।

বললাম, "মা শনিচরির সাধ দিচ্ছে।"

ও বললো, "কিন্তু তার জন্যে তুমি এমন করছো কেন? তুমিই তো বলেছো মা গরীবদুঃখীর দুঃখকষ্ট দেখলে গলে যান, সবার জন্যে করেন টরেন খুব ----।"

বললাম, "শনিচরির বয়েস জানো?"

"না।"

"তবে শুনে রাখো, শনিচরির বয়েস অন্তত পক্ষে চল্লিশ।"

রমেন বললো, "তা বয়েসটা অবশ্য গয়লানিদের তুলনায় একটু অ্যাড্‌ভান্সড্‌ই বলতে হবে। কিন্তু অন্যান্য দেশে চল্লিশ বছরের মেয়েদের লোকে আজকাল যুবতীই ধরে।"

বললাম, "শুধু তাই নয়। প্রায় তিরিশ বছরের বিবাহিত জীবনে একটিও বাচ্চা হয়নি শনিচরির। ওর বর অন্য পাড়ায় আর একটা বউ নিয়ে ঘর পেতেছে। গুচ্ছের ছেলেপুলে হয়েছে সে বউয়ের। অবশ্য শনিচরিকে একেবারে ত্যাগ করে নি ওর বর। মাঝে মধ্যে আসে। ডাক্তার বদ্যির দোরে অনেক ঘোরাঘুরি করেছে শনিচরি। আমার ছোটমামা বিলেত ফেরত 'গাইনি'। একবার উনি এখানে এলে মা চেপে ধরলেন শনিচরির চিকিৎসার জন্যে। ওকে পরীক্ষা করতে গিয়ে ছোটমামা তো রেগে কাঁই। ওর পেটে নাকি 'ইউট্রাস্‌' বলে পদার্থই নেই। শনিচরিকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল ওর পেটে নাকি অপারেশন হয়েছিল অনেক বছর আগে। একেবারে ছেলেবেলায়। কি নাকি সাংঘাতিক রোগ হয়েছিল পেটে। সে যাহোক, ছোটমামা বললেন ওর পক্ষে আর কোনদিন মা হওয়ার স্বপ্ন দেখা স্রেফ বাতুলতা। শনিচরির যদি বাচ্চা হয় তবে লেপ-তোষক -তক্তপোষেরও বাচ্চা হতে পারে। এ নাকি এহেন অসম্ভব কথা। সেই শনিচরিরই আজ সাধ দিচ্ছে মা।"

রমেন শুধু বললো, "হুম।"

মা দু'হাতে দু'গ্লাস ঘোলের সরবৎ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

বললাম, "আমায় বলেই পারতে ! এর মধ্যে আবার সরবৎ বানাতে গেলে কেন?"

মা গ্লাস দুটো আমাদের হাতে দিয়ে বললেন, "অতটা রাস্তা ট্রেনের ঝাঁকানি খেতে খেতে এলি ----।" তারপর আমাদের কথোপকথনের প্রসঙ্গ আন্দাজ করে বললেন, "তুই তো ঠাকুর দেবতা কিছুই মানিসনে আজকাল। তাই তোদের লিখিনি। গেল শীতে তোর ন'কাকার ছেলে বীরু এসেছিল। ওকে বলে শনিচরির জন্যে তাবিজ করিয়ে দিলুম।

অর্ধেক খরচা এই শনিচরিই দিলে অবশ্য। পুরো তিন মাস ব্রত পালন করলো। তিন সন্ধ্যে চান - মঙ্গলবারে হবিষ্যি, বিষ্যুৎবারে খিচুড়ি ভক্ষণ, শনিবারে নিরম্বু উপবাস। ব্রত উদ্‌যাপন পরদিন থেকেই শরীর খারাপ। ভাবলুম জন্মেও তো চান করার অভ্যেস নেই, রোজদিন তিনবার চান যাবে কোথায়।

ওষুধ দিতে গেলে বললো, 'না মাইজী, ঠাণ্ডা লাগার অসুখ এ নয়। আমি স্বপ্ন পেয়েছি এতদিনে আমার ঘরে দুলাল আসছে।'

"জানিস রিনু, আমিও বিশ্বাস করতে পারিনি প্রথমবার। ভেবেছিলুম ছেলে-ছেলে করে মাথাটাই বুঝি বিগড়ে গেছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সর্বলক্ষণ ফুটে উঠলো। এই তো আসছে মাসের গোড়ার দিকেই হবে।"

বললাম, "হাসপাতালে গেছিল?"

মা বললেন, "না রে। অনেকবার বলেছিলুম কিছুতেই রাজি হল না। বলে মাইজী, এতকাল এত ডাক্তারের কাছে ধর্না দিয়ে তো কচু হল। এখন আর যাচ্ছি না। বাবার দেওয়া জিনিস উনিই রক্ষা করবেন।"

"বাবার দেওয়া মানে?"

মা একটু অধৈর্য কণ্ঠে বললো, "ওই যে তাবিজটা। বাবা ত্র্যাম্বকানন্দ ঋষি মহারাজের কাছ থেকে তৈরী করিয়ে পাঠিয়েছে বীরু।"

রমেন বললো, "কাগজে প্রায়ই বিজ্ঞাপন থাকে বটে। হরেক রকমের মাদুলি তাবিজ। ডিলাক্স - সুপার ডিলাক্স ---- তেজী, মহাতেজী, বজ্রচুড়ামণি। তেজের অনুপাতে মূল্য ধার্য করা আছে। হাতে হাতে দাম ধরে দাও, ফলপ্রাপ্তিও হাতে হাতে।"

মা কিছু বলতে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে উঠোনের ওদিক থেকে মিহি বেসুরো গলায় গান ভেসে আসায় তড়িৎবেগে উঠোনমুখী হল নিজের বক্তব্য স্থগিত রেখে।

রমেন আমার পানে চাইলো, "বাবা কিছু বললেন না?"

বিরক্ত হয়ে বললাম,"বাবার তো ব্যবসাই এই, তাবিজ বিলি করে টাকা হাতানো। উনি আবার কি বলতে যাবেন?"

রমেন হাসি চেপে বিজ্ঞের মত মুখ করে বললো, "তা মন্দ ব্যবসা

নয়, কি বল? আমিও নেমে পড়বো নাকি? এ ব্যবসায় ওয়ান ক্যান কম্বাইন বিজ্‌নেস্‌ উইথ প্লেজার। তবে তোমাদের গয়লানির মত কাস্টমার গোটাকয়েক জুটলে ব্যবসা গুটিয়ে দেশান্তরী হতে হবে। তক্তপোষ না কিসের যেন উপমা দিয়েছিলেন তোমার ছোটমামা?"

নিঃশব্দে খানিকক্ষণ হেসে নিয়ে ঈষৎ গম্ভীর স্বরে রমেন আবার বললো, "আমি কিন্তু সেই বাবার কথা জিজ্ঞেস করিনি। আমি জানতে চেয়েছিলাম তোমার বাবা, অর্থৎ আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর মশায়ের কথা। অত বড় উকিল হয়ে এ সমস্ত ব্যাপারে কিছু বলেন না?"

আমি হতাশ ভাবে রমেনের মুখের পানে একমুহূর্ত চেয়ে রইলাম।

তারপর ধীরগলায় সংক্ষেপে বললাম, "না। বাবা বাড়ির কোন ব্যাপারে নাক গলান না। এবং পারতপক্ষে বাড়িতে থাকেন না। বাবা শুধু মস্ত বড় উকিলই নয়, ভোজপুর জেলার ব্রিজ চ্যাম্পিয়নও। ওকালতির পর বাকি সময়ের সবটাই তাসে হাত পাকাতে ও পাকা রাখতে ব্যয় হয়ে যায় তাঁর। বরং এও বলতে পারো ব্রিজ খেলার পর উদ্বৃত্ত সময়টাতে ওকালতি করেন বাবা। সেটাই বরং বেশী যথার্থ হবে। তুমি এ বাড়ির হালচাল এখনও জানো না। ক্রমে ক্রমে নিজেই জানতে এবং বুঝতে পারবে সব।"

রমেন চুপ করে গেল।

উঠোন পেরিয়ে ভোজপুরী গীতের ঐক্যতান ভেসে আসছে। দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখলাম তিন চার জন মেয়েলোক শনিচরির সামনে একটা থালা নেড়ে নেড়ে গান গেয়ে চলেছে। শনিচরি লম্বা ঘোমটা টেনে লজ্জায় ভাঁজ হয়ে বসে আছে তার বিপুল উদরভারের আড়ালে। মা অদূরে দাঁড়িয়ে এসব সমারোহ তদারক করছেন আর মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সুরে টান দিচ্ছেন। হঠাৎ এলাহাবাদে রমেনদের ছিমছাম বাড়ি, ওর ছিপছিপে চশমা পরা মার্জিত মা আর শান্ত মিতভাষী প্রফেসর বাবার কথা মনে পড়ে লজ্জায় যেন মাথা কাটা যেতে লাগলো আমার।

সেটা আন্দাজ করেই কিনা জানি না, রমেন নড়েচড়ে উঠে দাঁড়ালো, "আমি বরং একটু বাইরে ঘুরে আসি। অনেকক্ষণ বিড়ি টানা হয়নি, একটু দম দিয়ে আসি, কেমন?"

নীরবে ঘাড় নাড়লাম।

রমেন মার নজর বাঁচিয়ে বেরিয়ে গেল। আরও ঘণ্টাখানেক ধরে সাধপর্ব চলার পর শনিচরি মাকে ভক্তিভরে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিল। ওর সাধের পাওনা জিনিসপত্তরগুলো ওর সঙ্গিনী মহিলারা পোঁটলা বেঁধে নিয়ে ওর সঙ্গে সঙ্গে চললো। শুনলাম ওরা নাকি শনিচরির বউদিরা সব। ওকে দেখাশোনা করার জন্যে ওর কাছে এসে রয়েছে একজন। বাকিরা ননদের সাধ উপলক্ষে এসেছে। বউদিদের হাত ধরে, কাঁধে ভর দিয়ে অতি কষ্টে পা টেনে টেনে হাঁটছে শনিচরি।

বললাম, "একটা রিক্সা করলেই তো হত?"

মা বললো, "তুইও যেমন! ওর কি আর এখন রিক্সায় ওঠার অবস্থা আছে? তিনজন লোক লাগবে ওকে তুলতে।"

শনিচরির দশাসই পুরোভাগের দিকে চেয়ে মার কথায় সায় না দিয়ে পারলাম না।

মা নিজের মনে বিড়বিড় করতে লাগলো, "বলছে আসছে মাসে দিন। দেখে তো মনে হয় এখন তখন অবস্থা। গেঁইয়া মানুষ, হিসেবে গোলমাল করেছে কিনা তারই বা ঠিক কি?"

মনে মনে হাসলাম।

রমেন শুনলে নির্ঘাত নেপথ্যে টিপ্পনী কাটতো, "বলা যায় না, দেখুন বাবাই আবার হিসেবে ভুল করে ডবল ডোজ দিয়ে বসে আছেন কিনা ----।"

রমেন ফিরলো আরও ঘণ্টা দুয়েক পরে। আমার বাবাও একই সঙ্গে ফিরলেন। সবাই মিলে খাওয়াদাওয়া সারতে সারতে প্রায় বিকেল। চা খেয়ে রমেন আবার কেটে পড়লো। ওর কোন সহপাঠী এখানে সম্প্রতি বদলী হয়ে এসেছে।

রাগ করে বললাম, "বুঝেছি। সহপাঠীর টানেই এখানে আসা হয়েছে বাবুর, শ্বশুরবাড়িটা উপলক্ষ।"

ও রহস্যময় হাসি হেসে বললো, "চৌবের সঙ্গে আলাপ হলেই বুঝতে পারবে সেটা।"

বললাম, "পরশুই তো চলে যাচ্ছি আমরা, আলাপটা হবে কবে?"

রমেন বললো, "পরশুর মধ্যে কত কিছু ঘটে যেতে পারে!"

রমেনের অমনি রহস্য করে কথা বলা অভ্যেস। কিন্তু সেদিন যে শুধু ঠাট্টাচ্ছলে ওকথা বলেনি তা বুঝলাম দু'দিন পরে। অর্থাৎ আমাদের যাত্রার দিনে।

দুপুর আড়াইটার সময় ট্রেন। গাড়ি প্রায়ই লেট থাকে এবং সেক্ষেত্রে এলাহাবাদে পৌঁছতে গভীর রাত হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তাই সকালে ঘুম থেকে দেরী করে উঠবো ঠিক করেছিলাম। কিন্তু বিধি বাম। ভোররাত্তিরে দুমদাম করে সদর দরজায় ধাক্কা পড়লো। সেই সঙ্গে ভেসে এলো মিহি মহিলাকণ্ঠের বিলাপ। ঘুমচোখে ধড়মড় করে উঠে আলো জ্বালালাম। দেখি রমেন নির্বিকার বসে বসে সিগারেট টানছে।

শুধোলাম, "কিসের যেন আওয়াজ হল না?"

ও বললো, "হ্যাঁ, পুলিশ। বাবা ওদের সঙ্গে কথা বলছেন।

ভয়ে দিশেহারা হয়ে প্রশ্ন করলাম, "সে কি? পুলিশ মানে?"

রমেন সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল। তারপর আমার হাত ধরে জানলার কাছে নিয়ে গেল।

সদর দরজার সামনে তিনচারজন পুলিশের পোষাক পরা লোক। অফিসার গোছের একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাবা বাইরে এলেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে শনিচরি আঁচলে মুহুর্মুহু চোখ মুছছে। পরনে সাধের দিনের সেই শাড়িটা। কিন্তু একেবারে চাঁচাছোলা চেহারা। সেই গুরু গর্ভভারের চিহ্নমাত্র নেই আর। অফিসারের পাশের সিপাইটার কোলে বছর খানেকের এক শিশু। ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। বাবা সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নামলেন। পুলিশ অফিসার বাবাকে নমস্কার করে প্রতীক্ষমাণ জিপে উঠলো। শনিচরিকে নিয়ে বাকি লোকগুলো জিপের পিছনে উঠে ঝাঁপ তুলে দিল।

জিপ চলে যেতে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে দেখি মা হাপুস নয়নে কাঁদছে আর বাবা একটু তফাতে মুখ অন্ধকার করে বসে আছে।

আমাদের দেখে বললেন, "পাটনার শেঠ রাঘোমলের ছেলে ক'মাস

আগে চুরি গেছে। সারা দেশ তোলপাড়। সেই ছেলেটাকে এতদিন ধরে আমাদের গয়লানিমাগি আটকে রেখেছিল। ওর অ্যাকম্প্লিস ছিল আরও ক'টা মেয়েলোক। সবাইকে বলতো ওরা নাকি ওর বউদি। বউদিরা পুলিশের গন্ধ পেয়েই কেটে পড়েছে। অবশ্য ধরা পড়বেই। শনিচরি সবাইকে বলে বেড়িয়েছে ওর নাকি বাচ্চা হবে। পেটে পোঁটলা বেঁধে ঘুরে বেড়াতো। বাচ্চাটা ওদের বাড়িতেই ছিল। ঘরের বার করতো না। কেউ শুধোলে বলতো বউদির ছেলে। আর কারই বা মাথাব্যথা পড়েছে অত! ভেবেছিল এরপর রাঘোমলের ছেলেকে নিজের ছেলে বলে চালিয়ে দেবে।"

মা নিঃশব্দে কাঁদছে।

সেদিকে চেয়ে বাবা নির্মমকণ্ঠে বলে চললেন, "তোমার মা নাকি বীরুকে দিয়ে কি এক অত্যাশ্চর্য তাবিজ আনিয়ে দিয়েছেন। ঘটা করে সাধ দিয়েছেন। আবার বায়না ধরেছিলেন আমাদের বাড়িতেই ওর আঁতুর পাতবেন বলে। তা শনিচরিই রাজি হয়নি, জারিজুরি ভেঙে যাওয়ার ভয়ে। ওই বদমাইস মেয়েলোকটা আমাদের বাড়ি আড্ডা গাড়লে আর দেখতে হত না। আমাদের সুদ্ধু হাজতে পুরতো চৌবে।"

বললাম, "চৌবে কে ?"

"ওই তো এসেছিল। এখানকার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।"

রমেনের মুখের দিকে চাইতে ও চোখ সরিয়ে নিল।

তারপর নরম গলায় বললো, "জানি না ছেলেচুরির কি শাস্তি পাবে শনিচরি। এর পরও যদি ওর ছেলের সাধ থাকে ওকে বলবেন অনাথ আশ্রম থেকে বাচ্চা এনে মানুষ করতে। কত শিশু অযত্নে অনাহারে অকালে মরছে এদেশে। এদেশে আবার বাচ্চার অভাব?"

মা কান্না থামিয়ে অনুযোগের কণ্ঠে বললেন, "এ কি একটা কথার মত কথা হল বাবা? কোথায় পেটের সন্তান আর কোথায় অনাথালয় থেকে আনা ছেলে। সে কি এক জিনিস?" তারপর আবার আঁচলে চোখ মুছলেন।

ট্রেনের কামরায় বসে রমেনকে চেপে ধরলাম, "চৌবেকে তুমিই নিশ্চয় শনিচরির খবরটা দিয়েছিলে। বল সত্যি কিনা?"

রমেন মিটিমিটি হেসে বললো, "দয়া করে এ কথাটা আমার শাশুড়ি ঠাকরুনের কানে তুলো না। নতুন জামাইয়ের দফা রফা তবে।"

"কিন্তু রাঘোমলের অত বড় ছেলেকে কি করে নিজের বাচ্চা বলে চালাতো শনিচরি? লোকের সন্দেহ হত না?"

রমেন বললো, "সন্দেহ হবার হলে শনিচরির গর্ভধারণের সংবাদেই হত। ম্যাডাম, বহির্বিশ্বে এটা 'এজ অফ রিজনিং' হলেও এদেশে সেই মান্ধাতার আমলের 'এজ অফ বিলিফ'ই রয়ে যাবে আদ্যন্তকাল। ব্লাইণ্ড, ইররিশনাল, আনকোয়েশ্চেনিং বিলিফ। শনিচরির নবজাত সন্তানরূপে রাঘোমলের একবছরের গাবদাগোবদা ছেলেটাকে দেখে বাবার অত্যাশ্চর্য কেরামতি সম্বন্ধে জনগনের বিশ্বাস আরও অটুট হত। মহাশক্তি তাবিজের বাজার-দর বেড়ে যেতো হু হু করে।"